ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 238-245
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.028

বেলা বসুর ‘স্মৃতিপট’ : নারীশিক্ষা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমকাল

পর্ণা মণ্ডল, *পর্ণা মণ্ডল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন, কলকাতা, ভারত

Received: 12.11.2024; Accepted: 28.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Bela Basu's memoir Smritipot (2000) is a testament to the practical inspiration behind realizing the latent desires of the mind. Bela Basu is not a famous personality; she is simply one among the many ordinary housewives. She took up the pen with effortless spontaneity and simplicity. Society did not readily accept the positive aspects of women's education. Denying women the right to education and the patriarchal efforts to suppress them repeatedly hindered the progress of women. Yet, among all this, conscious families and individuals have helped in supporting women's traditional education. Bela Basu had an unyielding desire for education. In the early 19th century, her grandmother was a well-educated woman who had earned a scholarship. Growing up in such a family, Bela Basu aspired to higher education. However, in the 1940s, after studying until the eighth grade, her school was closed due to the onset of World War II. Despite this, she did not let go of her dream of higher education. Eighteen years after her marriage, she decided to take the school finals again with her son and succeeded with extraordinary brilliance. Afterward, despite domestic obstacles, she continued her education, progressing through intermediate, undergraduate, and special honors studies in succession. At a time when the rate of women's education was on the decline in India, Bela Basu's determination and her ability to reach the graduate level, even beyond the typical age for education, serve as an inspiring example of self-awareness and persistence. In her memoir, she describes her journey of education, setting an example for future generations of the realization of unstoppable willpower.

Keywords: Women's education, Indomitable willpower, Contemporary relevance, Traditional education.

বেলা বসুর স্মৃতিলিখন ‘স্মৃতিপট’ (২০০০) প্রবাদবাক্য ‘ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়’—এর সমার্থক। সেই অদম্য ইচ্ছা নারীর পরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে এসে আত্মঅন্বেষণের, আত্মবিশ্লেষণের ও সর্বোপরি আত্মপ্রতিষ্ঠার। তবে, ‘ইচ্ছা’ এবং ‘উপায়ে’র মধ্যবর্তী দূরত্ব স্থাপনের মূলচক্রী সময়-সমাজ। এই দূরত্ব দূরীকরণের হাতিয়ার শিক্ষা-বোধ-বিচক্ষণতা ও সচেতনতা। এই প্রক্রিয়ায় কোনো তত্ত্বগত একরৈখিকতা নেই, বরং ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্র। তবুও মানুষ অন্যের জীবনকথার বাঁক থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয়ে মগ্ন। তাইতো ব্যক্তির স্মৃতিকথা একক ব্যক্তি অতিক্রমী, সর্বজনীন। বেলা বসুর ‘স্মৃতিপট’ এমন এক ‘স্মৃতিলিখন,

যা মনের সুপ্ত বাসনা সত্যি করার বাস্তব অনুপ্রেরণা। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন বেলা বসু। আর পাঁচজন সাধারণ গৃহবধূর একজন তিনি। কলম ধরেছেন নিরাভরণ অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ততায়।

'নারী' ও 'প্রথাগত শিক্ষা' একসময় ছিল সামাজিক রক্ষণশীলতার চোখে পরস্পর প্রতিস্পর্ধী। এই সংক্রান্ত সমাজ নির্দেশিত কিছু অযৌক্তিক ট্যাবু নির্মাণ করে তা নারীমননে এমনভাবে নিষিক্ত করা হত, নারী বাধ্য হত আতঙ্কিত হয়ে প্রথাশিক্ষা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপত্তির কারণগুলির চমৎকার তালিকা রয়েছে *সর্বশুভকরী* পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে। সেগুলি হল—

(ক) 'শিক্ষা কর্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তাহা নাই।'

(খ) 'স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখনও নাই... অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ...।'

(গ) 'স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখে চিরকাল... জীবনযাপন করিবে।'

(ঘ) 'স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেন।'

(ঙ) 'বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক।'

(চ) 'পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক।'

'অতএব স্ত্রী জাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত।'[১]

উপরোক্ত কারণগুলি মনস্তাত্ত্বিক দৌর্বল্য বৃদ্ধির সহায়ক। প্রত্যেকটি প্রদর্শিত যুক্তির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত অন্ধকার সরিয়ে, আলোর দিশা দিতে পারে একমাত্র সুশিক্ষালব্ধ অকাট্য যুক্তি। নারীর সেই একদিনের না পারা দীর্ঘপথ অতিক্রমে প্রত্যয় অর্জন করেছে। ভয় দেখানো অযৌক্তিকতাকে অবিশ্বাস করে জীবনের পথে জয়ী হয়েছে। নারীর সেই জয়যাত্রার ইতিহাস সুদীর্ঘ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর এই মন্তব্য উত্থাপন করেছেন। এই উনিশ শতকেরই প্রথম দশকে (১৮১৩ সালে) চার্টার আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবেশ অবাধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের সচেতনতাবোধের তাগিদে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার শুভারম্ভ। তবে, এই সময় অনেক পরিবার তাঁদের মেয়েদের বহির্জগতে পা রাখা নিয়ে কুণ্ঠাবোধ করতেন, অথচ নারীশিক্ষার আবশ্যিকতা অস্বীকার করাও ছিল তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁরা অন্তঃপুরেই শিক্ষিকা নিয়োগ করে নারীর পাঠদানের ব্যবস্থা করলেন। তবুও এই উভয় সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে ছিল অনেক কম। কারণ তখনও অধিকাংশ পরিবার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন নারীশিক্ষার অযৌক্তিক নেতিবাচক ধারণা। নারীকে অবদমনের পিতৃতান্ত্রিক প্রচেষ্টা যাঁদের চোখে ধরা পড়ল, তাঁরা এগিয়ে গেলেন নারীপ্রগতির পথে। বেলা বসুর পূর্বপ্রজন্মে তাঁর ঠাকুমা ছিলেন উনিশ শতকীয় এমন পরিবেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে সুশিক্ষিতা পাত্রী ছিল দুর্লভ। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার মিকশিমীল গ্রামের প্রগতিশীল মিত্রবাড়িতে জয়চন্দ্র মিত্রের ছোট ছেলে হীরালালের পাত্রী অনুসন্ধানের সময় রূপের চেয়েও শিক্ষিতা পাত্রী ছিল কাম্য। বহু অনুসন্ধানে শ্বশুরমশাই নিয়ে এলেন তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পাঠগ্রহণ করা বউমা। নাম জ্ঞানদানন্দিনী। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ঠাকুরপরিবারের জ্ঞানদানন্দিনীর নাম। আলোচ্য জ্ঞানদানন্দিনীও যশোরনিবাসী ছিলেন। তবে, ইতিহাসের পাতায় তাঁর নামোল্লেখ নেই। আসেননি কোনো প্রচারের আলোয়। তাঁর যুগীয় অনুপ্রেরণা লেখা রইল বেলা বসুর স্মৃতিলিখনে। গ্রামে প্রতিবেশীরা যাঁরা জ্ঞানদানন্দিনীকে আবিষ্কার করতে পারলেন না, তাদের সংজ্ঞায় তিনি শুধুমাত্র একজন 'কালো মেয়ে' ও বরের পাশে বেমানান বউ। কিন্তু জয়চন্দ্র মিত্র রত্ন চিনেছিলেন। পারিপার্শ্বিক বিরূপতা থেকে বউমাকে আগলে আশ্বস্তও করতেন বারংবার।

একদিন মানুষ রূপের অসাড়তা বুঝে গুণের কদর করবেই, এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন জয়চন্দ্র মিত্র। এক্ষেত্রে, জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামী হীরালালের কোনো মন্তব্য ছিল না। তবে তিনি তাঁর পিতার মতামতকেই শিরোধার্য মনে করতেন এবং স্ত্রীয়ের প্রতি ছিল তাঁর যথার্থ সম্মান। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নববধূ জ্ঞানদানন্দিনীর সুশিক্ষার প্রকাশ পরবর্তীতে বেলা বসুও প্রমাণ পেয়েছেন। ঠাকুমা জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষাগত প্রতিভার কথা নাতনি বেলা বসু উল্লেখ করলেন স্মৃতিপটের কথামুখ অংশে—

> সত্যিই জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি, কঠোর শ্রম ও মানবিক গুণে বৃহৎ যৌথ পরিবারের শ্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন। সারা দিন খাটুনির পর রাত জেগে প্রদীপের আলোয় বই পড়তেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র, দামোদর, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ত্রৈলোক্যমোহনের গ্রন্থাবলী তাঁর আদ্যোপান্ত পড়া ছিল। রামায়ণ-মহাভারত টানা মুখস্থ বলে যেতেন তিনি। শুভংকরীর আর্যা ছিল তাঁর নখদর্পণে। মুখে মুখে এমন অংক করতেন যে সকলের তাক লেগে যেত। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার ভার ছিল তাঁর ওপর। তাঁর স্মৃতিশক্তি শেষ বয়স পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সব কবিতা বই না দেখেই অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন।[২]

বেলা বসু জ্ঞানদানন্দিনীর মতো নারীব্যক্তিত্বের বইপড়া, স্মৃতিশক্তির প্রতিভাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন আশৈশব। বেলা বসুর কালে যুগের বেলাও এগিয়েছে অনেক। উনিশ শতকের অপরার্ধে তখন নারীশিক্ষার সচেতনতাবোধও তুলনামূলক প্রসার পেয়েছে। তবুও পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়েদের সত্বর পাত্রস্থ করাই মুখ্য পরিণতি ধার্য করা হত। তারই মধ্যে থেকে বিবাহোত্তর জীবনে সন্তানের মা হওয়ার পরও সন্তানের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা বিসর্জন দেননি বেলা বসু। মনের সুপ্ত সেই বাসনাকে রূপ দেওয়া সহজ ছিল না। সেই ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়ার রোজনামচা লিপিবদ্ধ করেছেন স্মৃতিপটে।

বেলা বসুর পিতা রঙ্গলাল মিত্র। গর্ভধারিণী মাতা সুধারাণী। তবে, সুধারাণীর অকালমৃত্যুতে রঙ্গলাল দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী ঊর্মিলা। সমাজ 'সৎমা' নির্দেশিত যে নেতির প্রচার করে, তা যে সর্বৈব সত্য নয়, তার প্রমাণ বেলা বসু ও ঊর্মিলা বসুর আত্মিক সম্পর্ক। ঊর্মিলা প্রথম থেকেই বেলাকে নিজের বড় মেয়ের স্থান দিয়েছেন। আজীবন আগলে রেখেছেন স্নেহ আর মমতা দিয়ে। কোনো অংশে বুঝতে দেননি তিনি তাঁর গর্ভধারিণী নন। এমনকি বেলার পড়াশুনা করার ইচ্ছাকে তিনি সর্বদা সমর্থন করতেন। পিতা রঙ্গলাল মিত্র ছিলেন পেশায় পুলিশ। এই চাকরিতে ক্রমাগত ছিল স্থানান্তর। তাই বিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকে বেলাকেও নানান বিদ্যালয় বদল করতে হয়েছে। বেলা বসু উল্লেখ করেছেন যে, সেই আমলে অনেক পরিবারে বাড়ির বাইরে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে ছিল নিষেধাজ্ঞা। তাই নিজেকে তিনি সৌভাগ্যবতী মনে করেছেন। নড়াল স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করলেন বেলা বসু। তবে, সমস্যা হল সেখানে বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির পর পড়ার সুযোগ ছিল না। অথচ ছেলেদের বিদ্যালয়ে ছিল না এমন কোনো গণ্ডি। সেখানে উঁচু শ্রেণি অবধি পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ছেলে ও মেয়ের পড়ার ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য বেলা বসুকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। অথচ মনে তাঁর অদম্য ইচ্ছা, আরও উঁচু শ্রেণিতে পড়বেন। অগত্যা বাড়িতে বসে দীনেন্দ্রনাথ গুপ্তের ডিকেটটিভ গল্পের বই, মিঃ ব্লেকের রোমহর্ষক সিরিজ ইত্যাদি পড়তে থাকেন নিজস্ব পড়ার তাগিদে। পাশাপাশি সাংসারিক কাজও করতেন। তবে, প্রথাগত পড়ার আশা তিনি ছাড়েননি। একদিন আকস্মিকভাবে আবারও পড়ার সুযোগের হাতছানি পেয়ে কোনোভাবে তা ব্যর্থ হতে দেননি। ঠাকুমার সঙ্গে কলকাতায় পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে পিসির মেয়েরা উঁচু ক্লাসে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তাই ঠাকুমাকে জানালেন একান্ত মনোবাসনা। ঠাকুমা জ্ঞানদানন্দিনী, যিনি নিজে আজীবন পড়াশুনার কদর করেছেন, তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত করে তাঁর বাবাকে চিঠি লিখতে বলেন। বেলা বসুর

বাবাও সম্মতি জানালেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই পারিবারিক এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন বিশেষ সাধুবাদযোগ্য। বিশেষভাবে সমকালীন প্রেক্ষিত যেহেতু সিংহভাগ মেয়েদের পড়া সমর্থন করে না। শেষপর্যন্ত কলকাতার স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তির পরীক্ষা দেন। সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পিসির মেয়েদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পড়াশুনা দুই মাস নির্বিঘ্নে চলার পর গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় বাবার নতুন চাকরিস্থল বসিরহাটে চলে আসেন বেলা ও তাঁর পিসতুতো বোনেরা। ছুটি শেষে কলকাতা ফিরে আবারও দৈনন্দিন বিদ্যালয় যাবেন, সেই ভেবে আশ্বস্ত ছিলেন বেলা বসু। কিন্তু সমকাল এসে কড়া নাড়ল নিশ্চিন্তজীবনে। বিশ শতকের চল্লিশের দশক। ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ কলকাতায় এসে পড়েছে। কলকাতায় তখন জাপানি বিমান আক্রমণের আশঙ্কা। গভীর রাতের কলকাতার আকাশে বহু এরোপ্লেন উড়তে দেখা যাচ্ছে। বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন।

এমন ভয়াবহ আবহে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। বেলা বসু অন্য মেয়েদের মতো স্কুল বন্ধের খবরে মনে মনে খুশি হলেন না। কারণ, তিনি মনের একান্ত তাগিদে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন। তাই মাত্র দুই মাসের মধ্যে এই উদ্যোগ এভাবে নস্যাৎ করে দিল যখন সমকালীন উত্তাল আবহাওয়া, তখন তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন প্রবল—

> এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় এবং বাড়িতে আলো জ্বালা নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মধ্যেই সাইরেন বাজত আর ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত। বিমান আক্রমণের ভয়ে রাস্তার আলোগুলোতে কালো রঙের ঠুলি পরানো হয়েছিল। ...পিসেমশাই চিঠি লিখে জানালেন—'স্কুল বন্ধ—মেয়েদের এখন কলকাতায় পাঠাবার দরকার নেই।' ঝুনি-ফুনিরা খুশি হলেও আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মনের কোণে একটা আশংকা দেখা দিল—আমার হয়তো আর লেখাপড়া করা হবে না। মনের ভয় একদিন সত্যি হয়ে দাঁড়ালো।[৩]

স্মৃতিলেখিকার শিক্ষাগ্রহণের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে শব্দবিন্যাসে। সমকাল মানুষকে হাতের পুতুলের মতো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সমকালীন নেতিবাচকতা উত্তীর্ণ করে নিজের লক্ষে এগিয়ে চলাই লড়াকু মনের ধর্ম। বেলা বসুও তেমনটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই বিয়ের ভালো সম্বন্ধ পাওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বেলা বসু কিন্তু সম্বন্ধ আসার প্রথম থেকে চেয়েছিলেন পাত্রপক্ষের তাঁকে পছন্দ না হোক, যাতে তাঁর বিয়ের কারণে পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে সেই সময় বিয়ে করতে বাধ্য হন তিনি। এক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল পরিবারে মেয়েকে আরও পড়ার সুযোগ করে না দিয়ে এমনভাবে সত্বর বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যে পরিবারে আরও দুই প্রজন্ম পিছিয়ে সুশিক্ষিতা পাত্রী আনার রেওয়াজ ছিল, সেখানে বাড়ির মেয়ের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পড়তে পড়তে বিশ্বযুদ্ধের আবহে বিয়ে দেওয়া কাম্য নয়। যদিও কথায় আছে, মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে আটকায় পৃথিবীর কোনো শক্তির সাধ্য নেই। বেলা বসুও তাঁর সেই ইচ্ছাশক্তির জোরে মনের মধ্যে পড়াশুনা করার ইচ্ছা যাপন করে গেছেন। বইপ্রেমী সত্তাকে বিসর্জন দেননি বিবাহোত্তর জীবনে। পিসতুতো ননদের ছেলে কানু গল্পের বই ভালোবাসত। লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়ত। একথা জানতে পেরে, বেলাও কানুর পড়া হয়ে গেলে বইগুলো পড়তেন। বিয়ের সময় শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ছাড়া আর কোনো বই উপহার পাননি বলে আক্ষেপ করেছেন স্মৃতিলিখনে। তখনও কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্ক। সাইরেন বাজলেই শেল্টারে ঢুকতে হয়। তাই প্রথাগত পড়াশুনার ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয়ে ওঠেনি। কালক্রমে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। এরপর বেলার দাদার হবু ডাক্তার বৌদিকে দেখে মনের সুপ্তিতে থাকা পড়াশুনার ইচ্ছা জেগে ওঠে আবার। এক্ষেত্রে সমকালে মেয়েদের ডাক্তার হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত অবশ্যই নারীশিক্ষা প্রগতির সম্ভাবনা নির্দেশ করে। যদিও ১৮৮৬ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ভারতের প্রথম

মহিলা ডাক্তার হয়ে সমাজের একাংশের অন্ধ ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, তবুও সেই পথ অনুসরণকারিণীর সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। তাই পরিবারে এমন সুশিক্ষিত মেয়ের আগমন বেলা বসুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই মধ্যে এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের হাহাকার, দেশভাগ ও স্বাধীনতা। পারিপার্শ্বিক উত্তাল সময়ে স্বামী-সন্তান-সংসার রেখে বহির্জগতে পড়া আবার নতুন উদ্যমে শুরু করে ওঠা হয়নি তখন বেলা বসুর। পাশাপাশি তাঁর স্বামীর চাকরিসূত্রে ছিল নানান স্থানে বদলির প্রবণতা। সব মিলিয়ে বেলা বসুকে তাঁর পড়ার ইচ্ছাকে সুপ্ত রাখতে হয়েছে। অথচ চোখের সামনে তাঁর এক বোন তখন লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজে পড়ছে, এমনকি তাঁর মাসিও নবম শ্রেণিতে পড়ছে। কিন্তু যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল পাঠগ্রহণে, তাঁকেই সত্বর বিয়ে দেওয়া হল। তবুও হাল ছাড়েননি বেলা বসু।

> একদিন খবরের কাগজে পড়লাম তিন-চারটি সন্তানের মা একজন গৃহবধূ এই বয়সে লেখাপড়া করে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। খবরটা পড়ে মনে হলো আমিও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি। বিজুর বই নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কাউকে কিছু বলিনি। শুধুমাত্র আমার স্বামীকে জানিয়েছিলাম। উনি খুবই উৎসাহ দিলেন।[৪]

খবরের কাগজের এই সংবাদ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল গৃহবধূ বেলা বসুকে। বিজু তাঁর সন্তান। সন্তানের পাঠ্যপুস্তক পড়ে পুরানো পড়ার অভ্যাসে ফিরে আসতে চাইলেন। বিশ শতকের অপারার্ধে স্ত্রীয়ের নতুন ভাবে পড়াশুনা শুরুর ক্ষেত্রে স্বামীর মতামতের গুরুত্ব ছিল। একুশ শতকে সমাজের সর্বত্র নারী স্বাধীনচেতা হতে না পারলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে কারোর অনুমতি ব্যতীত স্বসিদ্ধান্তে শিলমোহর দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু পূর্বে তা সম্ভবপর ছিল না। তাই স্বামীর অনুমতি ও অনুপ্রেরণা বিষয়টি বেলা বসুর স্বপ্নপূরণের পথে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজ নির্দেশিত ছকে বাঁধা বয়সের সীমা অতিক্রম করে প্রথাগত পাঠগ্রহণের পথে ফিরছেন বেলা বসু। ছেলের সঙ্গে তৎকালীন স্কুল ফাইনাল দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। মা ও ছেলের চলল একই সঙ্গে পরীক্ষাপ্রস্তুতি। বেলা বসুর জন্য ব্যবস্থা করা হল একজন গৃহশিক্ষকের। শিক্ষক শ্রী মনোজ বক্সী প্রথমে ভেবেছিলেন বেলার ছেলেকে পড়াতে হবে। কিন্তু ছেলের মায়ের পড়াশুনায় উদ্যম দেখে তিনিও অবাক হন এবং অনুপ্রেরণা দেন।

> আমিই ছাত্রী শুনে উনি তো অবাক। বললেন—'আগে কত দূর পড়েছিলে?' আমি বললাম—'ক্লাস এইট পর্যন্ত'। মাস্টারমশাই শুনে বললেন, 'এভাবে হবে না। তোমাকে টেস্ট পেপার অনুযায়ী সব বিষয় পড়তে হবে। খুব পরিশ্রম করতে হবে মা।' আমি জোর দিয়ে বললাম—'আপনি যেভাবে পড়তে বলবেন তেমনি করেই পড়ব।'[৫]

এরপর এল বেলা বসুর ছোট থেকে মনের কোণে জমিয়ে রাখা উঁচু শ্রেণিতে পড়াশুনার ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণের জন্য পরিশ্রমের পালা। তাঁর যে বোন ইতিহাসে এম. এ পড়ছিল, সে ইংরাজি পড়ায় সাহায্য করে। ছেলে বিজুর হাতে লেখা ইংরাজি গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণের নোটপত্র মায়ের পাঠগ্রহণে সাহায্য করে। এছাড়াও ছিল গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরাজি ও অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ অনুশীলন। পাশাপাশি স্বামীর থেকে পেয়েছেন প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় উৎসাহ। এইভাবে ছেলের সঙ্গে মা প্রস্তুতি নিলেন স্কুল ফাইনালের। কাটোয়া স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন স্বামী প্রত্যেকদিন পৌঁছে দিতেন স্কুলে। টিফিনের সময় ডাব, মিষ্টি কিনে দিতেন। সন্তানতুল্য সহপাঠিনীরাও পেতেন বিশেষ অনুপ্রেরণা। সেইসব কথার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে 'স্মৃতিপট' স্মৃতিলিখনে।

বেলা বসু বিয়ের আঠার বছর পর পরীক্ষা দিতে বসেন। স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার হলের নিয়মকানুনের থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থেকে তিনি জোরে জোরে প্রশ্নপত্র পড়েন। সেই সময় শিক্ষিকা বিপ্লবী বীণা দাসের সান্নিধ্যে কেমনভাবে আসেন, সেকথা লিপিবদ্ধ করেছেন স্মৃতিলিখনে—

> আমি তো বহুদিন লেখাপড়ার জগত থেকে দূরে ছিলাম। তাই প্রশ্নগুলো জোরে জোরে পড়ছিলাম, উনি মিষ্টি করে বললেন—'মনে মনে পড়ো।' আমি কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—'দিদি, আমি বিয়ের আঠারো বছর পরে পরীক্ষা দিতে বসেছি। তাই সব নিয়মকানুন ভুলে গেছি।' উনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'ঠিক আছে—তোমার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। বরং সকলকে ডেকে দেখানো উচিত।' ওঁর কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পৃথিবীতে কত যে এমন মহানুভব চরিত্রের নারী ও পুরুষ আছেন তাঁদের খবর কেই বা রাখে।[৬]

উল্লেখ্য, বিপ্লবী নারীদের কথা। বীণা দাস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকন্যা। কিশোরী বয়স থেকে তিনি রাজনীতিমনস্কা। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের নেত্রী বীণা দাস ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। সেই কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে আন্দামান সেলুলার জেলে কারারুদ্ধ করা হয় নয় বছর। তারপর ফিরে এসে তাঁর পুনরায় রাজনীতিজীবনে যোগদান, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যপদ গ্রহণ, নোয়াখালি দাঙ্গা পরবর্তী রিলিফের কাজ, মরিচঝাঁপি গণহত্যায় প্রতিবাদী মুখ— এসব তথ্য পাওয়া যায় ধারাবাহিক ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু এই বীণা দাস যে আন্দামান থেকে ফিরে কাটোয়া স্কুলে 'অনারারি মিসট্রেস' পদে নিযুক্ত হয়ে ইংরাজি পড়াতেন, সেই তথ্য পাওয়া গেল বেলা বসুর এই স্মৃতিলিখনে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে বেলা বসু টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। স্বামী সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেইসময় তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীসেবা অস্বীকার না করেও স্কুল ফাইনালের প্রস্তুতি নিতে থাকেন বেলা। স্বামীর চিকিৎসার জন্য বনগাঁ এসে সেখানের স্কুল থেকেই পরীক্ষা দেবেন ঠিক করেন। ছেলে কাটোয়া স্কুলের কৃতি ছাত্র ছিল। তাই শিক্ষকেরা তাকে স্কুল পরিবর্তন করতে দেননি। তাই ছেলেকে কাটোয়ায় ব্যবস্থা করে পাঠালেন। বনগাঁয় থাকতেন বেলার বাবা-মা। তাঁরাও তখন তাঁর পড়া বুঝতে সাহায্য করেছেন। ভাই মিন্টুও দিদির সঙ্গে পরীক্ষা দেবে। এরপর যথাসময়ে হল স্কুল ফাইনাল। দুর্দান্ত ফলাফল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বেলা বসু। ফার্স্ট ডিভিশনে দুটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে পাশ করল বেলা। তাঁর ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে বেশ কয়েকটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে, ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করল। মা ও ছেলের সাফল্যে গর্বিত হল পরিবার। বিশেষ করে, বয়স যে কেবল সংখ্যার হিসাব, যোগ্যতা যে কোনো কিছু করতে পারার ইচ্ছা ও তাগিদ থেকে আসে, তা প্রমাণ করে দিলেন বেলা বসু।

স্কুল ফাইনাল দিয়েই থেমে থাকলেন না বেলা বসু। এরপর মনে আরও পড়ার ইচ্ছার খোঁজ পেয়ে স্বামী নিজেই বললেন পরবর্তী ধাপে পড়ার জন্য। সেই উজ্জ্বল স্মৃতি লিখে রাখলেন বেলা তাঁর 'স্মৃতিপটে'। তৎকালীন মেয়েরা প্রত্যেকে এমন অনুপ্রেরণাকারী স্বামী পেতেন না। তাই সেই যুগের অনেকের কাছেই এই বর্ণনা অলীক স্বপ্ন—

> বাড়ির কর্তা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'ইন্টারমিডিয়েট পড়বে তো?' আমি হাসিমুখে ওঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিলাম— 'এইরকম সংসারে এসে পড়েছিলাম তাই। তুমি সাহায্য না করলে আমার পক্ষে এত ভালো ফল করা সম্ভব হতো না। ইন্টারমিডিয়েট তো পড়বই।'[৭]

এছাড়াও বেলা বসু স্বীকার করেছেন, স্বামীর অসুস্থতার সূত্রে সেইসময় ঘটনাচক্রে বনগাঁয় বাপের বাড়ি এসে থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন বলে পড়াশুনায় সময় দিতে পেরেছিলেন বেশি। সর্বকালীন সত্য যে, শ্বশুরবাড়িতে সাংসারিক দায়বদ্ধতায় পড়াশুনা আর সংসারের সময়ের ভারসাম্যে সংসারের পাল্লা হয় ভারী। তাই বাপেরবাড়িতে মা-বাবার উপস্থিতিতে পাল্লা ভারী হওয়ার সুযোগ থাকে পড়াশুনার দিকে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন বেলা বসু। তবে, নিজের সংসারে ফিরতেই হল অবশেষে। স্বামী আবারও বদলি হলেন মাহেশের রামপুরিয়া কটন মিলে। ভ্রাম্যমান সংসার তাঁদের। সেখানেই রিষড়া কলেজে ভর্তি হলেন বেলা এবং প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল তাঁর ছেলে। মা ও ছেলে দুইজনেরই অভীষ্ট তখন ইন্টারমিডিয়েট। সংসার থেকে একপ্রকার সময় চুরি করে পাঠপ্রস্তুতি নিতে থাকেন বেলা। সেইসময় রান্নায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় রাঁধুনী নিয়োগ করেন, যাতে পরীক্ষার জন্য অনুশীলন যথাযথ হয়। এমন সময় এই রাঁধুনীকে ঘিরে শুরু হয় বিপত্তি। বেলা বসুর বিয়ের গয়না, পরবর্তী আরও গয়না সহ মেয়েদের গয়না বাড়ি থেকে চুরি যাওয়ায় সন্দেহভাজনের তালিকায় এই রাঁধুনীকে পুলিশ রাখলেন প্রথমে। সামনেই বেলার ফাইনাল পরীক্ষা। এতো ঝড়-জল পেরিয়ে এতটা দূর পৌঁছে তীরে এসে তরী যাতে না ডোবে, তাই পরীক্ষা পর্যন্ত সেই রাঁধুনীকে গ্রেফতার না করার জন্য বিশেষ আকুতি জানান বেলা পুলিশের কাছে। পড়াশুনার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য মরিয়া বেলা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> কাকাবাবু আমার গয়না যা গেছে তা তো আর পাব না। কিন্তু ঐ কাজের লোকটি না থাকলে আমি যে আই এ পরীক্ষাটা দিতে পারব না। আপনি যদি দয়া করে ওকে এখুনি না ধরেন তাহলে ভালো হয়। আমার পরীক্ষা সামনেই।[৮]

এভাবে মনের জোরে আর পরিস্থিতি সামলে ইন্টারমিডিয়েটে উত্তীর্ণ হলেন বেলা। তবে তিনি লিখেছেন ফল তাঁর আশানুরূপ হয়নি। ছেলে দুর্দান্ত ফল করে। বেলা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। কলেজে পড়ার সুপ্ত বাসনা জানালেন স্বামীকে। সাংসারিক দায়বদ্ধতায় সময়ের অভাবে তখন অনার্স পড়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যথাসময়ে স্নাতক হন। কিন্তু মনের মধ্যে অনার্স পড়ার জন্য যে খেদ রয়ে গিয়েছিল, তা দূর হল এরপর প্রাইভেটে ইকনমিক্স অনার্স পড়ার সময়। ইচ্ছা থাকলে যে উপায় ঠিক হয়, এই সাধারণ গৃহবধূ তার অকাট্য প্রমাণ। চাকরির ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ হয়ে ওঠেনি তেমন। তবে শ্রীরামপুর গার্লস স্কুলে দুই-তিনবার লিভ ভ্যাকান্সিতে চাকরির সুযোগ পেয়ে, সেই স্বপ্নের আস্বাদ পেয়েছিলেন। মানুষের জীবনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন-মানসিকতা-অগ্রাধিকার বদলায়। বেলার জীবনে তার স্বপ্ন ছেলে-মেয়ের প্রতিষ্ঠা। ছেলে বায়োকেমিস্ট্রিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করে আমেরিকায় পাড়ি দিল। মেয়ে বায়োকেমিস্ট্রিতে পি এইচ. ডি করছে। মায়ের কাছে সন্তানদের সাফল্য তখন নিজেরই সাফল্য। আজীবন কদর করেছেন পড়াশুনার। নিজের জীবনে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার অবকাশ দেননি। নিজস্ব তাগিদে ও স্বামীর উৎসাহে নতুন উদ্যমে বয়সকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে গেছেন প্রথাভিত্তিক পাঠগ্রহণের ধারাবাহিকতায়। জাতীয় তথ্য বলছে—

> ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নারীশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আনুপাতিক হারে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঘটেনি।.... নারীশিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের স্বার্থে সহায়ক বাড়তি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অভিপ্রেত সাফল্য পাওয়া যায়নি; ছাত্র ও ছাত্রীর মধ্যে পরিসংখ্যানগত পার্থক্য থেকে গেছে। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পরেও নারীশিক্ষার অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। ১৯৭৮-'৭৯ শিক্ষাবর্ষে এ বিষয়ে একটি জাতীয় সমীক্ষা সম্পাদিত হয়। তদনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট বিদ্যার্থীর মধ্যে ছাত্রীরা ছিল চল্লিশ শতাংশ। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়ে হয় তেত্রিশ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে

ছাত্রীদের আনুপাতিক হার আরও হ্রাস পেয়ে হয় মাত্র আঠাশ শতাংশ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই পরিসংখ্যান অধিকতর হতাশাজনক।[৯]

এই তথ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশে যখন নারীশিক্ষার অনুপাত নিম্নগামী, তখন আত্মসচেতনতায় নিজেকে স্নাত করে নিজস্ব মানসিক তাগিদে বয়স উত্তীর্ণ হয়েও স্নাতক স্তর অবধি পৌঁছানো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। স্মৃতিলিখনে সেই যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে আগামী প্রজন্মের মনে স্থাপন করলেন অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তির বাস্তবায়নের আদর্শ। যুগ এগিয়েছে, নারীশিক্ষার হার একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আশানুরূপ। তবুও ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা যুগ নিরপেক্ষ। তাই সেইসব ক্ষেত্রে এই 'স্মৃতিপট' অবশ্যই অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী। এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতাই একজন সাধারণ অপরিচিতার লেখনীকে করে তুলেছে সাহিত্যপদবাচ্য। শৈলীবিচারে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তম পুরুষে সহজ অভিব্যক্তি। সর্বোপরি স্মৃতিলিখনের আধারে বেলা বসুর 'স্মৃতিপট' নারীশিক্ষার অনন্য পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র :

১. রায় বিনয়ভূষণ, ঊনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা : অন্তঃপুর শিক্ষা, চন্দ পুলক (সম্পাদিত), নারীবিশ্ব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, গাঙচিল, কলকাতা, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৮৯-৯০।
২. বসু বেলা, স্মৃতিপট, প্রথম প্রকাশ, জয়শ্রী চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫।
৩. তদেব পৃ. ৩২।
৪. তদেব পৃ. ৫১।
৫. তদেব পৃ. ৫৫।
৬. তদেব, পৃ. ৫৬।
৭. তদেব পৃ. ৬৩।
৮. তদেব পৃ. ৬৭।
৯. মহাপাত্র ড. অনাদিকুমার, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, পুনর্মুদ্রণ, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৭৯৬।